উত্তরণী

(কবিতা-সংগ্রহ)

উত্তরণী

(কবিতা-সংগ্রহ)

শ্রীমৎ অনির্বাণ

সম্পাদনা ঃ
সঞ্জয় বিশ্বাস
ব্রততি মুখোপাধ্যায়

ধ্যানবিন্দু

নিবেদন

আনন্ত্যের পুরন্দরূপা পুষ্পনির্ঝরিণী 'কাজরী'র আক্ষোভ্য চিদাকাশ হ'তে বাসন্তী স্বপ্নলেখার অনন্যা প্রসূতি 'উত্তরণী'— হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে ভোরের আকাশ-ছাওয়া সৌম্যসুধাসিক্ত সিন্ধুরূপা তার বুকে বিলসিত গৌরী-বাকের দ্যুলোকবিহারী শব্দনির্ঝর। সিতোৎপল ভালবাসার মেদুর মালা গাঁথা হল যেন বিনিসুতায় পুঞ্জ-পুঞ্জ জ্যোতির স্তবকে ভূলোকের 'পরে— অবর্ণ মর্মরাগে স্নাত আত্মরাম স্রষ্টার স্বপ্নসম্ভূতি 'উত্তরণী'— দ্যুলোকের কাব্য; 'মমার ন জীর্যতি।'
'উত্তরা' আপ্তকাম কাব্য-রূপকার শ্রীমৎ অনির্বাণের ২১টি কবিতার সংকলন। *আর্যদর্পণ* পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী মহারাজের অনুগ্রহে আলোচ্য কবিতাবলীর প্রত্যয়িত রূপ লাভ করে। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণীতি ও কৃতজ্ঞতা।
ধ্যানবিন্দু প্রকাশনার পরিচালক অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সানন্দ উৎসাহে এই কবিতাবলীর উজ্জ্বল প্রকাশ— তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা।

জুলাই, ২০২১ যুগ্ম-সম্পাদক
কলকাতা সঞ্জয় বিশ্বাস ও ব্রততি মুখোপাধ্যায়

সূচি

‘আবির্ আবিরাবীর্ম এধি’

ভোরের আকাশে
ভালো করে আলো না ফুটতে
আনন্ত্য যেন মুখর শিশুর মতো আদুরগায়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের ’পরে।

বাইরে যেমন দিক্‌চিহ্নহীন আকাশের আনন্ত্য,
অন্তরের সদ্যোজাত নিস্তব্ধ গহনেও তেমনি
কালকলনাহীন বিজ্ঞানের আনন্ত্য। আর
তাদের জড়িয়ে হওৱার দুর্ধর সংবেগ।

আমার অনুপাখ্য সত্তার চিৎকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে
তুমি হচ্ছ ... হচ্ছ ... হয়েই চলেছ ...
আনন্ত্যের উদার চিত্রল সংবেগে, কাজরী।
দেশে তুমি শতরূপা, আবার কালে ইচ্ছার অনিবর্ত্য প্রেষণায়
খ-ধূপের মতো পুরুরূপা পুষ্পনির্ঝরিণী।
তার ঝর্ঝর ঝঙ্কারে
সপ্তশতীর সেই উদাত্ত ঘোষণা শুনি দু’কান ভরে :
‘একৈৱাহং জগত্যত্র কা দ্বিতীয়া মমাপরা।’

তুমি হয়ে চল, কাজরী ... তুমি ঝড়ের মতো ধেয়ে চল
‘আরভমানা ভুৱনানি ৱিশ্বা।’ আর
তোমারই হৃদয়ের মণিকূটে
নিশ্চল হয়ে নিষ্পলক নয়নে আমি শুধু দেখি
দ্যুলোকের সমূর্ধ্বে প্রাণাগ্নির সপ্তশিখায় লেলিহান
তোমার মূর্ধন্যচৈতন্যে এক সন্দীপন রমণীয়তা,
দেখি পাতালের গহন গভীরে তেমনি আবার
‘অপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে’
আধারকমলের আরেক সম্মোহন কমনীয়তা।

আবার দু’য়ের অন্তরিক্ষে
চরাচর জুড়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের হোমানলে
আমার আত্মাহুতির অতন্দ্র সাধনা।।

11.10.74

হিন্দোলায়

আধুনিক মনের দ্বন্দ্ব কোথায়, জান কি কাজরী?
চেতনার পরাক্ আর প্রত্যক্ বৃত্তি নিয়ে।
কবি বাইরের জগৎকে অন্তরে এনে দেখেন ভাবের মেলা,
আর বৈজ্ঞানিক অন্তরের বৈদ্যুতীকেও
যন্ত্রে বন্দী করে দেখেন তার রূপের খেলা।

কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা—
তা নিয়ে তর্ক করা বোকামি।
কবির চোখে বাইরে তুমি রূপ, অন্তরে ভাব—
আর তারও নিতল শূন্যতায়
সামরস্য-বিগলিত অস্তিতার অনিরুক্ত আনন্দ।

তাই সে-আনন্দের মায়াঞ্জন চোখে মেখে
আমি দেখি, জগৎ জুড়ে যে
'ভাব আর রূপের অবিরাম যাওৱা-আসা'
তার মণিকর্ণিকায়
সৃষ্টি ও প্রলয়ের দোলায় তুমি দুলছ, কাজরী।

মহাশূন্যের নিঃসীম নিরুত্তরে
ক্ষণ আর বিন্দুর যুগনদ্ধতায় অস্তিত্বের যে-শক্তিকূট,
তার একটি রশ্মির আতনন
'সীমানং ৱিদার্য' তোমার-আমার ভ্রূমধ্যে ফোটায়
আমারই ভাব হতে বিচ্ছুরিত তোমার রূপ।

সে-রূপে শুধু রঙের খেলাই তো নয়,
আছে রসেরও দোলা।
আকাশ-বাসরের নির্দীপ স্তব্ধতায়
সে-রস কেবল অকৈতব প্রাণের আরাম আর অকরাণ মনের আনন্দ,
আর তারই উচ্ছলন প্রপঞ্চোল্লাসের ফেনিল পরিকীর্ণতায়।
একটিতে তোমার আত্মরতি, আরেকটিতে আত্মক্রীড়া—
একই ভাবের বিবর্তে তুমি জায়া এবং জননী।

আর আকাশের উষর ধূসরে
তোমায় আমি জড়িয়ে আছি
প্রপঞ্চোপশম সম্প্রসাদে।

অরূপের আভায় বিহ্বল তোমার মুগ্ধ নয়নে
ফোটে মহিমার ছায়াতপ, আর
অব্যক্তের নিস্পন্দ কীলক হতে
শুরু হয় দোলকের সব্যসাচী দোলা—
ওই ভাব, এই রূপ। দু'য়ে দ্বন্দ্ব কোথায়, কাজরী?

17.1.75

চাওৱা-পাওৱা

কোথায় যেন কবি বলেছিলেন,
অনেক পাওৱার মাঝে একটি পাওৱায়
আচমকা দখিন-হাওৱা জাগানোর কথা—
তোমার মনে পড়ে, কাজরী?

কত চাওৱা-পাওৱার ছিনিমিনি সারা জীবন ধরে।
তার মধ্যে একটি দিনের অপরূপ একটি পাওৱা
যেন স্বাতীর একবিন্দু চোখের জল—
উন্মুখ শক্তির সম্পুট ভেদ করল অতর্কিতে :
আর অমনি ওভামের বাসরঘরে
সুকৃতী স্পার্মেটাজোৱার অণুকে ঘিরে
নেমে এল রহস্যের যবনিকা।
তার পর থেকে
সে গহন-গভীরে কারও প্রবেশের ছাড়পত্র রইল না।

সেদিন আমার কী হয়েছিল মনে নাই, কাজরী।
হয়তো চাওৱা ছিল না।
অসীম শূন্যতা : তার মধ্যে
'আনীদ্ অৱাতং স্বধয়া তদ্ একম্।'
লঘুভার এক স্তব্ধতার ব্যাপ্তি—
তার অণুতে-অণুতে প্রসন্নতার স্নিগ্ধ শিঞ্জন।
তার পর কোনও অঘটন যদি না ঘটত,
কেউ যদি না আসত,
কিছুই হত না।

কিন্তু হল। তুমি এলে,
অকারণে খুশির দোলায়
ঢেউ তুললে অতনু আকাশের বুকে।

নিষ্ফল ভূমার বিরজা বিথারে
কুসুমিত ভালবাসার উচ্ছল প্রমন্থন
রাশি-রাশি শিউলি আর দোলনচাঁপার সৌরভে
অস্তিত্বের অণুতে-অণুতে
কেমন নেশা ধরিয়ে দিলে যেন।

বলব না, সম্বিৎ ছিল না। সে হত পরাভব।
বলব না, আস্বাদ ছিল না। সে হত মরণ।
ছিল শান্তিতে সমৃদ্ধ অমৃতের সন্তনন
অশ্বত্থপত্রের শিরায়-শিরায়।
তার পর এক ভেঙে দুই হল : কখন যে
দেখি, আকাশ ফোটো-ফোটো আলোয় থরথর।

সেই অপরূপ পাওৱার ধ্রুবা স্মৃতি নিয়ে
আমার প্রভাতের নিরঞ্জন সূচনা কাজলে-সোনায়।।

13.5.77

‘মরিয়া হইবি রজক-ঝি’

বাশুলীর সেদিনকার ওই কথাটা
আজও ভ্রমরগুঞ্জনের মত কানে বাজছে, কাজরী :
‘মরিয়া হইবি রজক-ঝি।’
নিরতি-বিবশা তোমার এলিয়ে-পড়া লাবণ্যচ্ছটার পানে
চেয়ে-চেয়ে মনে হয়েছিল
বৈবস্বত-মরণের এ যেন আরেক পিঠ।

বাশুলীর অনুশাসন নির্ঘাত সত্য :
অনেক মরণেই মরতে হবে পুরুষকে—
তার পরিশেষ মহাপরিনির্বাণের অনালোকে।

সে তো ফুরিয়ে যায় না সে-মরণে :
সম্বোধিতে জেগে ওঠে মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বরের অরোরা নিয়ে।
জিতশ্বাস মহাবিদেহধারণায় সে আকাশ-শরীর, আর
সে-আকাশে বহুশোভমানারূপে
তোমার অতর্কিত আবির্ভাব, কাজরী,
তুষারকন্যা হৈমবতী উমার মতো।

চেয়ে-চেয়ে দেখি,
অবসানা অনগ্না একহায়নী নগ্নিকা গায়ত্রী তুমি।
গন্ধর্বের স্থূলহস্তাবলেপের শঙ্কায় তোমার যে-জুগুপ্সা,
অচ্ছোদের তীরে তা-ই
আলোর ছোঁৱায় কমলের মতো দল মেলে।
সুমধুর লজ্জার পাটল আবরণ
তখন তোমার আভরণ, আবরণ তো কদাচ নয়।
ফুলের সৌন্দর্যে আবরণ কই :
ভালবাসাও কি তেমনি অবসানা অনগ্না নয়?

আমার আপ্তকাম চাওৱার আকাশে
তুমি শুধু স্বচ্ছ আভার নীহারিকায়
আনন্দ-চিন্ময়তার রূপরেখা।
সে-রেখার চূড়ায়-চূড়ায়
আমার আলোর ছোঁৱা মেদুর ছন্দে গড়িয়ে চলে। আর
ষোড়শী বরতনুতে অতনুর আমর্শন
ভ্রূমধ্যের উজানে ইন্দ্রধনুচ্ছটার রোমাঞ্চ জাগায়।

অস্তিত্বের অন্তিম বলয়ে তুমি
নিরতি-নিথর কিশোরী তখন।
আর আমিও চণ্ডীদাসের মতো
নিতল তোমার রহস্যের গহন-গভীরে
'মরিয়া হই যে রজক-ঝি।'

13.5.77

উর্বশী

'নেয়ং যাময়মুপাস্তে।'
তোমার উপাসনা জড় তনুতে নয়—
সত্ত্বতনুতে আর অতনুতে, কাজরী।
মহাশূন্যের সাঁতারু পুরুষকে বলতেই হবে বারবার :
'হেথা নয় ... অন্য কোথা ... অন্য কোনখানে।'

এ-চাওৱা প্রবৃত্তির শরমুখ চাওৱা তো নয়—
নিবৃত্তির নিঃসীম চাওৱায় এ শুধু
স্পর্শের মণিকর্ণিকা হতে
অস্পর্শরতির আনন্ত্যে ছড়িয়ে পড়া।

তখনও আমি আছি
বিন্দু হয়ে নয়, সিন্ধু হয়ে—
অগণিত চূর্ণরশ্মিতে যার অকম্প্র মহিমার বিকিরণ।

এ-ও কাম। কিন্তু এ সেই কাম যা
'অগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং য়দাসীৎ।'
তার অবন্ধ্য প্রেষণায় তোমার বিসৃষ্টি, কাজরী,
উর্বশীর মতো সিন্ধু হতে।
পুরূরবার আকুল কান্না তাকে বাঁধতে পারেনি, কিছুতেই।
কিন্তু পুরূরবা আর ঐল নর নয়—
সে এখন নারায়ণ,
আর শ্রী হয়ে তুমি জড়িয়ে আছ তার অঙ্গে-অঙ্গে।

রৌদ্রকরস্নাত প্রভাতসিন্ধুর বুকে উর্বশীর তনুবল্লরীতে
ঝিরিঝিরি আলোর কাঁপন—
মর্ত্যতনুতে সে অমৃত-আনন্দকে কি বন্দী করা চলে?
সীমার উপান্তে
রূপের হালকা রেখায় অসীমের অকূল ইশারাই
তাতে ফুটে ওঠে শুধু।

তোমার অকামহত শ্রোত্রিয় হৃদয়ের অজন্তায় তুমি কেবল
রেখার মায়া। আলোর পটে আলোর রেখা বুলিয়ে যাই
আলোর তুলিতে। আর তার
বঙ্কিম বিভঙ্গে হৃদয়ের প্রদ্যোত অতনু পরশের বীচিভঙ্গে
হিল্লোলিত হয়ে চলে। আকাশ তখন শান্ত,
তার প্রতিচ্ছায়া সিন্ধুর বুকে তুলছে
ঝিরিঝিরি আলোর কাঁপন। বিসৃষ্টির ব্রহ্মলগ্ন যেন।

তখন তোমায়-আমায় যে-আত্মবিনিময়,
তা অতনুতে সত্ত্বতনুর হিন্দোল কেবল।
না, না— এর উপাসনা কেউ করেনা, কাজরী।।

13.5.77

তবুও

কাব্য গেল, পুতুল-পূজাও গেল।
কোথায় তাহলে তোমায় পাব, কাজরী?
বিজ্ঞান ছাল ছাড়িয়ে মাংস চেঁছে
তোমার কঙ্কালটা বের করে বলবে,
'দেখ, এটাই ওর মোক্ষম সত্য।
গুঁড়িয়ে সার করে মাটিতে ছড়িয়ে দাও গে'—
দুনো ফসল ফলবে।
পেটের আগুন আগে ঠান্ডা করে,
তারপর হিয়াদগদগি পরাণপোড়নি
পুড়াতে যাওৱার বিলাসিতায় মাতা—
সেটাই ভাল নয় কি?'

কিন্তু
কাব্য ধর্ম বিজ্ঞান সব যদি-বা যায়,
তবু আমার চোখ যে থাকবে, কাজরী :
বিশ্বতশ্চক্ষুর আকাশজোড়া পলকহারা চোখ—
ষড়্দর্শনের ধূমল দৃষ্টিকেও যে সে ছাপিয়ে গেছে।
তা-ই দিয়ে দেখছি, তুমি আছ—
আমরা নিকষ কালো চোখের তারায়
উত্তরবেগুনীর অদৃশ্য রশ্মির মাঝে কাঁপছ।
দ্রষ্টা হয়ে আমি আছি, তাই দৃশ্য হয়ে তুমি আছ,
আর তুমি আছ বলেই আকাশ আছে আলো আছে,
আছে মেঘ-রৌদ্রের টানা-পোড়েনে বোনা
শ্যামলী ধরার ছিপছিপে অঙ্গে জড়ানো ধূপ-ছায়ার অঙ্গরাগ।
সব সত্য, সব সুন্দর, সব মধুর।

সেই মধুরের মাধুরীতে রসানো
সব যে তখন সত্য :
চোখের সামনে-দেখা বিজ্ঞান, আবার
অন্তরের গহন গভীরে তলিয়ে-পাওৱা কাব্য এবং ধর্ম,
সব জড়িয়ে সব ছাপিয়ে
তোমার আর আমার অলখ আলোয়-নাওৱা
আকাশের অগম বাসর,
সব সত্য।।

14.1.75

কত দূরে

আমার আকাশ চিরে সূর্যের উদ্‌ভাস
অবর্ণের বর্ণবিচ্ছুরণে।
স্বমহিমায় জেগে উঠে বলি : আমি ভূমা, আমি আকাশ—
আর তুমিও আমার পৃথিবী, কাজরী।

দ্যুলোক সন্নত হয়েছে পৃথিবীর বুকের ’পরে
কিন্তু কোথায় সে— কত দূরে? আঁধারের প্রেতচ্ছায়া
নিয়তির অভিশাপ হয়ে
কোথায় তারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল?
আজ কি তার মনে পড়ে না, একদিন এই সবিতার
প্রসারিত বাহুর বলয়ে
আলোর বুকে সে আলোর কুঁড়ি হয়ে নিশুতিরাতের শেষে
দল মেলার আশায় ছিল?

তুমি হয়তো ভুলে গেছ, কাজরী—
কিন্তু আমি তো ভুলিনি। অনির্বাণ জ্যোতির্দহনের
জ্বালা নিয়ে জেগে আছি—
আকাশের এক প্রান্ত হতে আরেক প্রত্যন্তে
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে। আমি শান্ত, তাই আমার ব্যাপ্তিতে
বিন্দু হতে বলয়ে বিচ্ছুরণের গতি নাই। আছে শুধু
বিশুদ্ধ অস্তিতার আনন্দে
দিক্‌চিহ্নহীন আনন্ত্যের অনিঃশেষ চেয়ে থাকা।

দেখছি, সেই অস্তির গহন গভীরে
তোমার শ্যামল কৈশোর সহসা জেগে ওঠে
অজানার শিহরণে। তুমি দুলছ, কাজরী—
তোমার সমুদ্র দুলছে বুকের কাছে
নিথর আকাশের ছোঁয়ায় চকিত হয়ে দুলছে,
অভ্রোত্তরণ শূন্যতার পানে উন্মনা আকূতি মেলে দিয়ে দুলছে।

সবিতার হিরণ্যপাণি হয়ে তোমার হৃদয়কে ছুঁয়ে থাকি :
ধীরে-ধীরে সেখানে পাপড়ি মেলে আলোর কমল।
নিজেকে চিনতে পার—
চিনতে পার তুমি দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসুর অপ্সরী?
আকাশ বুঝি তখন আরও দূরে— কোন্ নিঃসীম দূরান্তরে।

এবার চেয়ে দেখ তোমার
বিস্রব্ধ কৈশোরের পানে, কাজরী। না, একেবারে সে
মিলিয়ে যায়নি। সূর্য অস্তে যায়, আকাশে জ্যোৎস্নার বান
মধুর আবেশে দু'চোখ তোমার বুজে আসে।
হারানো কৈশোর চুপিচুপি
রজনীগন্ধার সৌরভ বিছিয়ে দেয় চেতনায়।

তবুও আকাশ কত দূরে। আবার কত কাছে, কাজরী।।

জীবন্মৃত্যু

জীবনের নিশ্চিত পরিণাম যে মৃত্যু,
পশু তা জানে না— জিজীবিষার অন্ধ তাড়নায়।
বিবিক্ত মানুষ তাকে জানে এবং মানে,
আর উপভোগ করে রসিয়ে-রসিয়ে।

এইটাই কি জীবনের আর্ট নয়, কাজরী?
'ব্রহ্ম আর ক্ষত্রের ওদন স্বাদু হয় মৃত্যুর উপসেচনে'—
এমন অদ্ভুত কথা যে বলতে পারে,
সব-পেয়েছির দেশে গিয়েও তার তৃষ্ণা মেটে না। তাই
জীবনের কানাগলিতে তোমার বিরহে সে
ঘুরে মরে আমার মতন।
তার একদিকে জিজীবিষার উজানধারা,
আরেক দিকে মুমূর্ষার ভাটার টান।
একদিকে দিনের আলো, আরেক দিকে রাতের আঁধার।
কর্ম আর বিশ্রামের ছন্দে জাগরণ আর সুপ্তি :
যেন আমি আর তুমি।
আবার কখনও-বা তুমি আর আমি।

দুয়ের মিলনে
চেতনার দক্ষিণ-দুৱার খুয়ে যায়—
মুখামুখি দেখতে পাই বৈবস্বত মৃত্যুকে।
নচিকেতার বিস্রব্ধ কৈশোরের প্রসন্নতা
স্মিতহাস্যে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

এই মৃত্যুর পিপাসা আমায় উন্মনা করে তুলেছে, কাজরী।
জীবনে তোমার ছায়া শুধু—
ওইখানে তুমি কায়া।

‘মধ্যা কর্তোঃ সংহর’ আমায়।
আমার কাজের মধ্যেই নেমে আসুক
তোমার কাজল মায়া :
আমি জানি, বুঝি, পাই— শুধু তোমাকে ... শুধু তোমাকে ...
শুধু তোমাকেই।।

ঈডিপাস

“ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকারমণী?” ছিলে।
কিন্তু আমি কোনোদিন বালক ছিলাম, ভাবতে পারি না।
সচেতন হয়ে তোমার মহিমা আমি
আবিষ্কার করেছিলাম জীবনের প্রথম প্রহরেই।
অদ্ভুতভাবে আমার মধ্যে মিশে ছিল
আত্মনিবেদনের সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা।

আমি শিবস্বরূপ, তাইতে পিতৃঘাতী।
আমার পিতা ছিল না কোনওদিন,
কিছুতেই মনের ত্রিসীমানায়
তাকে ঘেঁষতে দিইনি আমি।

পদ্মের মতো আমার হৃদয়ে ফুটে উঠেছ তুমি :
তোমার কষিতকাঞ্চন মুখের পানে চেয়ে
আকাশের আনন্ত্যে আমি বৃহৎ হয়েছি।
‘সোঽহম্’ ঃ অতএব আমার শৈশব আর কৈশোর দুইই মায়া।
আমার সত্তায় তোমার ইন্দ্রধনুচেতনার প্রতিচ্ছবি।

তুমি কিন্তু শিশু—
সকালে-কুড়িয়ে-আনা শিউলির সুকোমল সৌরভের মতো।
আবার তুমি বালিকা—
রেশমের পাপড়িতে সুকুমার দোপাটির মতো।
তুমি কিশোরী— সবিতার সোহাগে
ঝলমলিয়ে-ওঠা পিটুনিয়ার মতো।
তুমি তরুণী— অনুরাগের রঙে রাঙা পারুলের মতো।
তুমি যুবতী— নিবিড় পল্লবের আবেষ্টনে
প্রস্ফুটিতা হিমচম্পকের মতো।

মেঘভাঙা কচি আলোর মতো শিশুর হাসি,
আকাশের সুনীলে-নাওৱা বালিকার লক্ষ্যহীন শুভ্র দৃষ্টি।

দখিন-হাওয়ার আচমকা ছোঁয়ায়
কখন সে শিউরে উঠে চোখের পাতা নামিয়ে নিয়েছে আরক্ত কপোলে,—
সেই মুহূর্তেই লজ্জাবীজের অরুণিমায়
তোমার কৈশোরের জন্ম হল, কাজরী।

এতদিন পথ চাওয়ার পর
আমার মরণের মালঞ্চে এই প্রথম ফুটল জীবনের ফুল—
চোখ বুজে রুদ্ধশ্বাসে
কপোতবক্ষের দুরুদুরুতে বলল, ‘ভালবাসি’।

ঈডিপাসের পিতৃহত্যার এই পুরস্কার :
‘জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে?’

জনতন্ত্র

তোমার কৈশোরের মাধুরী দিয়ে
ভেবেছিলাম কবিতা রচব, কাজরী।
হল না। সমস্ত পৃথিবীর বোঝা এসে চাপল মাথার ’পরে,
বাসুকির ঘাড় বেঁকে গেল :
মুখ থুবড়ে সে পড়ে আছে কুঁজো হয়ে।

আজ বুঝি,
জীবনের প্রথম অভিশাপ জনতা।
হু-হু করে জনতা বাড়ছে—
না আগাছা বেড়ে চলেছে। ইতর-ভদ্রের তফাত কোথাও রইল না।
সাহিত্যে সংগীতে শিল্পে জীবনের আনাচে-কানাচে—
সর্বত্রই ইতরামি : জনগণমনের অধিনায়ক
শালীনতা নয়— বর্বরতা।

রেডিও ভাল, ছায়াছবিও ভাল—
বিশ্বের অনেক-কিছু জানা ভাল তো বটেই;
কিন্তু তা বলে আগাছা-আবর্জনা ভাল নয়।
তার আতিশয্যে সভ্যতা জাহান্নমে চলেছে, সংস্কৃতি বিপন্ন।
আগাছা উপড়ে ফেলতেই হয় :
মানুষ হলেই তার বাঁচবার বাড়বার অধিকার আছে—
একথা মানি না। অন্ত্যজের স্থান সভ্যতার উপকণ্ঠে।
এপার্টহাইড্ নিছক মানবতার অপমান নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচুর্য এনেছে যেমন,
তেমনি এনেছে সমস্যাও
উপকরণ-বাহুল্যে পীড়িত জীবন
আদিম আরণ্যক সরলতা হারিয়ে
অন্তরে ফতুর হয়ে গেছে।

অপরিগ্রহে অপ্রগল্‌ভ জীবন,
অন্তরে নভোবিহারের আনন্দ :
শেষ-পর্যন্ত এতেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না?

আজ তা হবে না, জানি।
মানুষের যোগী হতে এখনও ঢের ঢের দেরি।
ততদিন এই হট্টগোলের প্রতি বধির হয়ে
আপনমনে তোমাকে নিয়ে কাব্য করি না কেন, কাজরী?
জনতন্ত্র যেমন চলছে, চলুক। আমরা
প্রতীক্ষা করতে জানি।।

মুন্‌লাইট

ওদেশের মুন্‌লাইট— বলতাম, ও 'বনজোসিনী'।
কাল তার একটি কুঁড়ি দেখে আশা করেছিলাম—
আমার শেষ সন্ধ্যায় আজ ও ফুটবে।
ফুটল না। হয়তো কাল ফুটবে, হয়তো-বা পরশু।
কিন্তু আমি ওকে দেখতে পাব না।
না পেলেও দুঃখ নাই।
আমার আশার ফুল নাই-বা ফুটল,
কিন্তু তুমি তো আমার ফুটেই আছ, কাজরী।

পৃথিবীর দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে :
ওকে পেতে চেয়েছিলাম সুন্দর করে।
পেলাম না। ওর মন পাওৱা যায় না।
কারই-বা যায়? ভালবাসা তাই
দুদিনের হেলা-ফেলা শুধু।
মনের ওপারে যেমন জ্ঞান, তেমনি প্রেম।
দুইই যোগ— বিজ্ঞানভূমিতে যার প্রতিষ্ঠা।
যোগিনীর ভালবাসা ছাড়া সব ভালবাসা মেকি।
একেবারে মিথ্যা নয়— কিন্তু ক্ষণিকার আলো।

ইওরোপার মন স্বৈরিণী। আর আমার ভারতী?
সে অমায়িকা যোগিনী, সে সতী— আমার স্বপ্নের পৃথিবী।
সে-ই তো আমার তুমি। তাকে বুকে টেনে এনে চোখ বুজি :
বলি, 'অহং শিবঃ', বলি 'ইয়ং গৌরী'।
বলে ফুরিয়ে যেতে পারি, যাইও।
সঙ্কর্ষণই সত্য, শূনত্যতাতেই ভালবাসার প্রতিষ্ঠা।

ফুরিয়ে গিয়েই দেখি, গৌরীর হিরণ্যচ্ছটা।
সে সতী— কিন্তু তার সত্তার বোঁটার বাঁধন
আমারই শূন্যতাতে। মুন্‌লাইট ফোটে—
কিন্তু দিনের আলোয় নয়।
ফোটে সন্ধ্যায়— সারা রাতই ফোটা তার
ঘুমে আর জাগরণে একাকার হয়ে।

একহারা সুতনুর শুভ্র আভা, তদ্গত হৃদয়ের সুকোমল সৌরভ।
ও কথা বলে না— রাতের মুখে তো কথা নাই।
বাক্ বিসৃষ্টি ঃ ও আমার অবাক্ অনাসৃষ্টি।
কাল সন্ধ্যায় ফোটেনি। কিন্তু আমার বুকে ফুটেই আছে।

না, দুঃখ করবার কিছুই নাই।
অনেক সয়েছি— এইটুকুও সইবে।
সহিষ্ণুতার পূর্ণাহুতিতে
দিনের আলো নিবে যেতেই মুন্‌লাইটের ঘুম ভাঙবে।
আমার বুক আলো হয়ে উঠবে
মৃত্যুর নিকষকালো পটভূমিকায়। কেউ নাই—
শুধু তুমি আর আমি, কাজরী। অথবা
শুধুই তুমি, শুধুই আমি।।

27.8.76

গুড্ ফ্রাইডে

গুড্ ফ্রাইডে। ক্রুশবিদ্ধ চেতনা হ'তে রক্ত ঝরার দিন।
পৃথিবীর চোখের জল আমি মোছাতে পারছি না—
সেই বেদনা কাঁটার মতো বিঁধে রইল পাঁজরে।

থাক্। রক্ত ঝরুক। বেদনা না থাকলে
জীবন যে হত মৃত্যুর মতো শুভ্র নিঃসাড়।
যত উঁচুতেই উঠি না কেন, ভাবের বিকিরণ ঘটাবার
উপলক্ষ্য একটা থাকা চাই-ই চাই—
একটা বাধাকে পরাভূত করবার বীর্য। আলো নিঃশব্দে ছড়ায়,
কথাটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য হলেও
তার বিস্ফারণেই কি বিস্ফোরণ নাই?

পৃথিবীর জন্য আমি চিরকাল ব্যথা পেয়ে যাব।
সৌরকলঙ্ক দুর্মোচন। এবং তাইতে
আদিত্যের বীর্যের উল্লাস।।

12.12.76

কুঁড়ি আর কাঁটা

দুটি সত্য গলাগলি হয়ে আছে—
যাদের পৃথক করবার উপায় নাই : সূর্য আর তার কলঙ্ক।
মূলা অবিদ্যার ক্ষয় নাই।
আবার সে না থাকলে বীর্যেরও প্রকাশ হয় না।
তাই সে থাকুক—
কাঁটার মতোই বিঁধে থাকুক সত্তার মর্মমূলে।

শুনেছি, ফুল হয়ে ফুটতে পারে না যে-কুঁড়ি,
সে-ই নাকি অভিমানে আক্রোশে সঙিন উঁচিয়ে থাকে কাঁটার মতো।
ফুলও ঝরে, কাঁটাও মরে। একটি মরে আলোর বুকে
উজিয়ে যাবার প্রশান্ত আনন্দে,
আরেকটি মরে জীবনে পরাভবের বেদনাকে ঢাকবার জন্য।
শেষ পর্যন্ত আলো আর আঁধারের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়।

নির্দ্বন্দ্ব অদ্বৈত অধিষ্ঠান মাত্র। তার একটা গৌরব আছে।
কিন্তু তবুও দ্বন্দ্বকে সে নিঃশেষে দূর করতে পারে কি?
থাক তবে একের বুকে সবাই থাক— মিলে-মিশে আঁচড়ে কামড়ে।

ক্রুশবিদ্ধের বেদনার জয় হোক, কাজরী।।

13.12.76

মনের মানুষ

ইওরোপের বস্তুবাদী সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন,
‘জগৎ আমার মনের মায়া নয়।
‘আমি আছি বলে সে আছে তা নয়,
‘বরং সে আছে বলেই আমি আছি।’

তা-ই বটে। এই সূত্র ধরেই কি বলতে পারি না—
‘আমি ভাবছি বলেই ভাবনা আছে, তা নয়।
‘ভাবনা আছে বলেই আমি ভাবতে পারছি।
‘আমি না থাকলেও ভাবনা থাকবেই।’

আবার ফিরে যাই দেকার্তের দর্শনে :
‘ঈশ্বর আছেন বলেই আমি ঈশ্বরকে ভাবতে পারি।’
ভল্‌তেয়ার টিপ্পনী কাটলেন,
‘আমার মনের মতো ক’রে। তা-ই নয়?’

আমি বলি, হাঁ, তা-ই তো।
ওই তো আমার মনের মানুষ।।

15.12.76

অপরূপ

ঠিক তা-ই। আমার মনের মতো করে
ঈশ্বরকে আমি ভাঙছি গড়ছি।
একটা অচর রূপ গড়তে চাইছি, কিন্তু পারছি না।
দেখছি, সবই চলে— সব সরে-সরে যায়।
শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকে না। অথচ কিছু থাকে।

এসে পৌঁছলাম উদ্দালকের সদ্‌ব্রহ্মে।
অথবা বৌদ্ধ-প্রস্থানের অসৎ-এ।
দুটি ভাবনায় ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পায়— এবং আমারও।
আমি আছি, শুধু আছি। কিংবা আমি নাই, আছে
আকার-প্রকারহীন একটা বোধ মাত্র।

কিন্তু তা-ই সব নয়। অব্যাকৃতিতে ব্যাকৃতি দেখা দেয়।
অরূপের বুকেই চলতে থাকে রূপের ভাঙা-গড়া।
ভাঙতে-ভাঙতে গড়ে চলি। অবশেষে গড়ি সুরূপাকে।
গড়ি মনের মতন করে। কিন্তু
সে-মনের মায়াকে চোখ মেলে কোথাও দেখতে পাই না।
চোখ বুজে বিদ্যুতের রেখায় তার আদল দেখি আকাশের বুকে।
ক্বচিৎ ইতিহাসে। ক্বচিৎ প্রতিমায়।
ক্বচিৎ এর ওর তার মুখে।

সব মায়ার ছায়া। তবু কি অপরূপ।।

16.12.76

দ্বিদল

কিন্তু তাকে ব্যবহার করতে পারি না।
ওই যে বলেছিলাম, 'ৰৰ্ম্মণোপস্পৃশামি' ঃ অগম উত্তুঙ্গতা হতে
আলতো ছোঁৱায় মানসের জলে ঢেউএর শিহরণ তুলি।
বস্তুতে পাই যখন, তখনও
ওই আকাশে উজান বেয়ে চলা ছাড়া উপায় থাকে না।

সত্যতা বস্তুতে নয়— ভাবে।
বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর একটা আকৃতি শুধু।
তাতে অর্থের আরোপ করে মন—
যে-মন আছে, আমি না থাকলেও আছে।
বস্তুবাদী তার প্রতি চোখ বুজে থাকলেও সে আছেই।
চোখের তারায় যে তার সন্ধান পায়,
সে-ই ঈশ্বরের দেখা পায়— অন্তরে এবং বাইরে।

যা প্রত্যক্ষ, তার সত্য আছে— শাশ্বত হয়েই আছে।
অচর আর চর, দুটি সত্তা নয়— দু'য়ে মিলে দ্বিদল সত্তা।

এমনি করেই তোমায় পাই কাজরী— অকূল শূন্যতায়।
দেখি, অচর আলোর বুকে তুমি চরন্ত আলোর বিদ্যুৎ।।

পরিপ্লব

কোথা হতে অদীনসত্ত্ব তারুণ্যের জোৱার এল আজ
হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে, কাজরী।
ভোরের আকাশ মেঘের ভারে থমথম করছে—
বৃষ্টি এই এল বলে। আসুক, সে যেন
দ্যুলোকের সোম্যসুধার নির্ঝর—
যেন তোমার ভাষাহরা ভালবাসার অকূল প্লাবন।

হঠাৎ ভালবাসার অর্থ বুঝি স্পর্শক্ষম প্রাঞ্জলতায়
উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তুমি আমায় ভালবাস, কাজল—
অনাদিকাল থেকে ভালবেসে এসেছ।
ভালবাস আমার মর্ত্যতনুকে, যা তোমার
কৌমারী শুচিতার বাসন্তী স্বপ্নলেখা।
ভালবাস আমার অমর্ত্য তনুকে,
যা তোমার বেলাশেষের কাজ-খোৱানো বৈরাগ্যের ধূসর নিঃশ্বাস।

আমি আছি, বাইরের জগৎকে নস্যাৎ করে দিয়েই আছি।
কম্যুনিজ্‌ম্ আর ক্যাপিটালিজ্‌ম্-এর গজকচ্ছপের যুদ্ধকে
নিতান্ত ছেলেমানুষি জেনে
সকৌতুক প্রশ্রয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখছি— এবং আছি।

আঃ, কী আরাম, কাজরী।
আমাকে আমি যা ভাবব, আমি তা-ই। তোমাকে আমি যা ভাবব,
তুমিও তা-ই। তুমি ফুরফুরে জ্যোছনার সৌরভ,
আর আমি প্রসন্ন আকাশের নির্বাক্ নীলাঞ্জন।

চলুক অঝোর বর্ষণ, কাজরী।
আমি জানি, সূর্য উঠবে সূর্য নামবে এই পৃথিবীর বুকে—
আমার আজ সকালের তারুণ্যোদ্বেল হৃদয়ের পারাবারে
আর ভালবাসার সিতোৎপল হয়ে তুমি টলবে,
আনন্দে বারবার ছল্‌কে উঠবে, কাজলসোনা।।

14.12.76

মানসোত্তরী

এই কথাটাই দাগ কেটে বসেছে মনের মধ্যে—
জীবনের শেষ ক'টা দিন,
শুধু তুমি আর আমি।
নাই-বা বাইরে তোমায় পেলাম—
তার জন্য একবিন্দু দুঃখ নাই :
শুধু অন্তরে তোমাকে চাই।
আমার পৌরুষ আছে, তাই সে-চাওরা
কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। আমি
অক্ষোভ্য হৃদয় নিয়ে তোমার স্বপ্ন দেখে যাব, কাজরী—
যে-স্বপ্ন একান্তভাবে আমার একার।

পৃথিবীকে বলেছিলাম, আকাশ হয়ে
তোমায় ভালবাসব। ভাল বেসেছি, বাসবও।
তার জন্য বাঁচব আর মরব— একথা আমি ভুলিনি।

আজ দ্যুলোক ভরে আছে আমার স্বপ্নে।
পৃথিবীর বুকে সে-স্বপ্ন যেদিন সত্য হবে,
আমি সেদিন থাকব না। কোথায় যাব,
কোথায় থাকব— কিছুই ভাবছি না, কাজরী।
জগৎ মিথ্যা হয়ে যাক্।
শুধু তুমি আমায় জড়িয়ে থাকো,
জড়িয়ে থাকো এই চিরবিরহতপ্ত হৃদয়কে—
আমার অতনু মহিমাকে।
তোমার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে ছিলাম, তোমার স্বপ্ন নিয়েই যেন মরি।

ব্যথায় হৃদয় খানখান হয়ে যাচ্ছে—
তবুও তাকে কত সহজে বইতে পারছি।
শুধু এইটুকু আশা,
দিনান্তে আমায় তুমি জড়িয়ে ধরবে এসে,
বলবে, 'এই যে আমি, এই যে তোমার সতী!'

আর আমার মানসোত্তর কৈলাসে জ্বলে উঠবে
কোটিসূর্য-সমপ্রভ কোটিচন্দ্র-সুশীতল
আলোর অরোরা।।

29.8.76

চম্পাবতী

খুব সকালে কাজ শুরু করব, কথা ছিল।
হঠাৎ চম্পা এসে পড়ায় সব এলিয়ে গেল।

কিশোরী চম্পাকে দেখলাম— কতদিন পরে।
'না, তুমি যাবে না' :
হাসির আড়ালে উদ্গত অশ্রুকে চেপে রেখে বলেছিল একদিন।
এই কথাই আরেকদিন শুনেছিলাম লক্ষ্মীর মুখে,
ভোরের আবছা আলোয় ভাগীরথীর তীরে।
সেদিন অশ্রুর অঝোর নির্ঝর
সে-ও ঢাকতে চেয়েছিল এমনি করে।

দেশ আর কালের সীমায় বাঁধা
লক্ষ্মীর আবছা ছায়ার উপর
ছড়িয়ে পড়ল শাশ্বতী চম্পার আভা।
আশ্চর্য লাগছিল, কী করে যে আমারও বাঁধন
খসে গেল মুহূর্তের মধ্যে। এই আকাশও পূর্ণ হল
সেই স্ত্রীতে, বহুশোভমানা হৈমবতীর অনির্বাণ দ্যুতিতে।

মানসীর মালা গাঁথা দেখছিলাম : বিনা সুতায়
গুচ্ছ-গুচ্ছ অরূপের কোরক নিয়ে নিপুণ হাতে।
গাঁথা শেষ না হতেই আমায় উঠে পড়তে হল :
ঘর তখন ভরে গেছে তরুণ সূর্যের দাক্ষিণ্যে।।

12.12.76

পরিনির্বাণ

আঁতিপাতি করে দেখেছি, পৃথিবীতে আমার তৃপ্তি নাই—
অন্তরিক্ষে কিংবা দ্যুলোকেও নাই।
আমার তৃপ্তি আকাশে বা আমাতে : তণ্হার উজানে
সম্যক্সম্বোধির পরিনির্বাণে।

আমাকে আমি গভীরভাবে পাই যদি, আমার কামনারূপে
বিচ্ছুরিত হও তুমি— স্বধার আনন্দে এবং বীর্যে।
আমি তখন তোমায় 'ৰর্ষ্মণোপস্পৃশামি', একটু আলতো ছোঁৱায়
শিউরে তুমি দ্যুলোকের তুঙ্গতা হতে।
সেই শিহরণকে আবার আকর্ষণ করি আমার হৃদয়ে ঃ
সেইখানেই তোমার সমস্ত আকৃতির পরিনির্বাণ।

তারপরে দেখি, আকাশের বুকে
ঝিরিঝিরি ঢেউ উঠেছে ভোরের হাওয়ায়।
সে তুমি না আমি, বুঝতে পারি না।
তোমার রূপ গুটিয়ে আসে
স্পর্শসুকুমার হিমচম্পকের একটি কলিতে,
আমার ভাব বিচ্ছুরিত হয় তোমার
আকাশ-উজানী সুতনুর মূর্ছনায়।
আমার অসীম জুড়ে
রূপের কুৱাশায় মরণাভিসারী স্পর্শের রোমাঞ্চ, কাজরী।

এই তুমি, এই তুমি। পৃথিবী তোমার ছায়া।
আর তার মধ্যে
আমার লোকোত্তর তণ্হার সুতর্পণ।।

15.12.76

যোগমায়া

'অস্তীত্যেৱোপলব্ধব্যঃ'—
এর চেয়ে বড় কথা আর নাই।
সে-'অস্তি' শান্ত মৌনী নিথর। সে যোগস্থ।

'পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি'—
তারই এক কোণায় এই চাঞ্চল্য, এই ভূতের মেলা।
তার মর্ম-সত্য যে উত্তরণী আকূতি, তা-ই রাধার কৈশোর।
রাধা পরঃকৃষ্ণ আত্মারামের স্বপ্ন-সম্ভূতি—
অসম্ভূতির নিকষে সুবর্ণরেখার মায়া।

সে-মায়া আকাশের আনীল ধূসরে বুলিয়ে দেয়
অবর্ণের বর্ণরাগে রচিত ময়ূররোমা আলপনা।
অস্তির মালঞ্চ
অকারণ অবারণ খুশিতে উলসে ওঠে।

শ্রাবণের রিম্‌ঝিম্ চলছে রাত-দুপুর থেকে।
ভোরে উঠে দেখি,
আমার মালঞ্চ ঝড়ো হাওৱায় তছ্‌নছ্ হয়ে গেছে
তা হোক। শ্রাবণে আর ফাল্গুনে তফাত করাটা নিছক মূঢ়তা।

শ্রাবণে আর ফাল্গুনে
কুরুক্ষেত্র চলছে চেতনার অন্তরিক্ষেও।
তার উজানে আকাশ—
'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিৰমদ্বৈতম্।'
সে-আকাশে বুক ভরে গেল।

পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলাম,
তার মেঘবাষ্পল শ্রাবণ-হৃদয়ের আড়ালে ফুটছে
রাধার অশ্রু-ছলছল কৈশোরে
চিরফাল্গুনের প্রতিশ্রুতি।

কাজলে-সোনায় ছাওৰা তোমায়
বড় ভাল লাগল, কাজরী।।

22.8.76